একক ৪২ ❐ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন ; ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ ; বাংলায় তিনটি রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত বন্দোবস্ত

গঠন ঃ

৪২.০ উদ্দেশ্য

৪২.১ প্রস্তাবনা

৪২.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

- ৪২.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ
- ৪২.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর
- ৪২.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা
- ৪২.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকীকরণ
- ৪২.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

৪২.৩ বাংলার ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

- ৪২.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা
- ৪২.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবসথা
- ৪২.৩.৩ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

৪২.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি (১৭৫৭-১৭৭২)

৪২.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

৪২.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

- ৪২.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)
- ৪২.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

৪২.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

- ৪২.৭.১ পটভূমি
- ৪২.৭..২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

৪২.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

- ৪২.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

৪২.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব
৪২.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব
৪২.৯ সারাংশ
৪১.১০ অনুশীলনী
৪১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তার পরিণতিতে এক নূতন ধরনের বিকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের আর্থিক প্রক্রিয়ায় নতুন স্রোত সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ইংরেজরা পুরাতন আর্থিক কাঠামোর বিলোপ ঘটিয়ে প্রচলন করে চলেছিল নূতন আর্থিক পদ্ধতির। পরিণতিতে প্রাক-ব্রিটিশ যুগের (প্রায় হাজার বছরের পুরাতন) স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়তে থাকে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ যৌথ জীবনযাত্রার বিনাশ যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য ঐতিহাসিকভাবে তার প্রয়োজন ছিল (যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলেছে)। এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা—

- ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর কেমন করে হল জানতে পারবেন।
- প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় ভূমি-ব্যবস্থার বিন্যাসের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- ইংরেজদের নুতন রাজস্বনীতি ও তার পিছনে সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- ইংরেজদের নূতন রাজস্বনীতি ও তার পিছনে সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকীকরণ প্রক্রিয়ার উত্তরণ কালপর্ব (যা পাঁচ দশক পূর্বে শুরু হয়েছিল) কিভাবে সমাপ্ত হচ্ছে সেটি মূল্যায়ন করার পর—নানা তর্ক-বিতর্কের সমালোচনা করে নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

৪২.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। একটা আধুনিক জাতি যারা নিজের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল ; একটি পুঁজিবাদী জাতি যারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর থেকে উন্নত হয়ে উঠেছিল ; যে জাতির মধ্যে তখন জাতীয়তাবাদ প্রবল—সে জাতি ব্রিটিশ জাতি ; যারা উপনিবেশ

ভারতের আর্থিক কাঠামোকে গড়তে চেয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনভিত্তিক। ভারতে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শাসনের প্রসারের ইতিহাসের পাল্টা চিত্র হলো প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করেছে, অন্যদিকে 'এশীয় উপাদানভিত্তিক' সমাজের অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তিকে স্থাপন করেছিল। এটি করার জন্য প্রয়োজন ছিল মুঘলদের থেকেও অনেক সংহত রাজনৈতিক ঐক্য। কৃষিব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকেই ব্যবহার করে ইংরেজরা চেয়েছিল রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে। যেহেতু বাংলা-সুবায় রাজনৈতিক আধিপত্য রচনার মধ্য দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা, তাই এই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইদানিং উপনিবেশবাদ শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ইতিহাস চর্চায় এই শব্দ এক ভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় আমরা কয়েকটি ঘরানা দেখতে পাই—(১) জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার জনক দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা, ওগুলিকে আদি ঘরানাও বলা যায়। এংদের লেখায় দেওয়ানী লাভের পর থেকে গ্রামবাংলার অর্থনীততিে অবক্ষয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের গৃহীত রাজস্ব নীতির ফলে গ্রামসমাজে উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতা, কৃষককুলের দুর্দশা ইত্যাদির মূলে ঔপনিবেশিক শাসনকেই দায়ী করা হয়েছে। (২) থিওডর মরিসন, জর্জ চেসনি, রিচার্য স্ট্রেচি প্রমুখের বক্তব্য হল—উপনিবেশগুলির অগ্রসর সম্ভবপর হয়েছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে, রেল, রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিচের পরিকাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার (কৃষি ও শিল্পে) আধুনিকীকরণ না করলে এশিয়া ও আফ্রিকা অনগ্রসর থেকে যেত (৩) মানবেন্দ্র রায়, রজনীপাম দত্ত, ডি. ডি. কৌশাম্বী প্রমুখের মার্ক্সীয় ভাবনায় প্রভাবিত অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চা নতুন মাত্রা এনেছে। (৪) গবেষকদের প্রধান বক্তব্য হল—ইংরেজদের গৃহীত উপনিবেশিক রাজস্বনীতি ও অর্থনীতির নূতনত্ব কিছু ছিল না। ঐতিহ্য-বিরোধী যা চুলা করতে চেয়েছিল সেটি আসলে পুরানো ব্যবস্থারই অনুবৃত্তি মাত্র।

৪২.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফরে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ভারতীয় উপমহাদেশে শক, হুণ, পাঠান, মুঘলরা ক্ষমতা দখলের লড়াই করতে এসে কখনই গ্রামীণ সমাজের ভিতরে অইধকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়নি। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ ভারতবর্ষে দেশীয় রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল গ্রামের উপর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা, জমি দখলের লড়াই নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায় ভূস্বামীরা উৎপাদনের অংশের উপর অধিকার লাভেরই লড়াই করেনি, বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা কৃষিতে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছে। সুতরাং গ্রামসমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যে অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় গ্রামসমাজে তার চিহ্ন বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইউরোপের মতো ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। রাজা বা মধ্যবর্তীরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমির নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে য়েনি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ

করতে চায়নি। আসলে 'এশীয় উৎপাদনভিত্তিক সমাজের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র রয়েছে। এক কখনও সম্পূর্ণ অর্থে সান্ততান্ত্রিক সমাজ বলা যায় না। অবশ্য অনড় না হলেও ভারতীয় সমাজ ছিল 'বদ্ধ' সমাজ।

৪২.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ

প্রাপ্ত উপাদানসমূহ থেকে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেছে তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ভারতীয় সামাজিক বিন্যাস প্রধানত ভূমি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। ভূমি-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলির ছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, আত্মনির্ভরশীল বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এক উল্লেখযোগ্য দিক। চাষবাসের পুরানো পদ্ধতি ও সহজ সরল যন্ত্রনির্ভর প্রয়োজনভিত্তিক হস্তশিল্পের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আত্মনির্ভরশীল গ্রামগুলি। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে বিশেষ সমর্থনযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় না। গ্রামে অন্তর্গত জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে ছিল গ্রামসভা বা পঞ্চায়েতের হাতে। সম্মিলিত পরিশ্রমদানের মধ্য দিয়ে চাষ-আবাদ সম্পন্ন হত। গোচারণ ভূমি, বনভূমির উপর অধিকার ছিল সবার ; সেচ, জলসরবরাহ, কীটপতঙ্গ ও গবাদিপশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা হত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। গ্রামে বসবাসকারীরা যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল। কোন সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমি নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়নি। এই গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন কাঠামো অক্ষুণ্ণ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। (দেখুন, A. R. Desai—*Social Background of Indian Nationalism,* Bombay, 1876)।

তৃতীয়ত, গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ রাজস্ব হিসাবে প্রদানের পর বাকিটা অধিকাংশ স্থানীয় পর্যায়ে উপভোগ করত। হস্তশিল্প যা কিছু গড়ে উঠেছিল সেটিও ছিল প্রয়োজনকে ভিত্তি করে। গ্রামের ছুতোর, মুচি, কুমোর, ধোবা, তেলি প্রমুখেরা উৎপাদন করত গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিনিময় ছাড়াও গ্রামভিত্তিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গ্রামের শ্রমবিভাজন ছিল অসম্পূর্ণ। কৃষকরা অবসর সময়ে যেমন সূতা কাটত, কারিগরেরাও প্রাপ্ত জমিতে চাষ করত। গ্রামের কারিগরী কলাকৌশল খুব একটা উন্নত মানের ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য গণ্ডগ্রামের হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল। এককথায় আর্থিক প্রশ্নে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। চতুর্থত, গ্রামগুলিতে এক ধরনের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী জনগণের মন ছিল সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অসহায় অবস্থায় তাদের মন ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হত। সার্বজনীন, আর্থিক ও সামাজিক জীবন-চেতনা গড়ে ওঠেনি তখন। ঐক্যের ধারণা যেটুকু ছিল সেটি ছিল ধর্মীয় অর্থে। পঞ্চমত, গ্রামসমাজে জাত ব্যবস্থাভিত্তিক সংগঠন। গ্রামবাসীরা জাতপ্রথাকে দৈবাদিষ্ট বলে গণ্য করত। জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মানসিকতা সে যুগের গ্রামবাসীর মনে প্রায় ছিলই না। এককথায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় গ্রামসমাজ আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিমালিকানাহীন হলেও উদার মানসিকতা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তার অভাব ছিল (*Social Backgrfound of Indian Nationalism,* p. 22)।

৪২.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় গ্রামসমাজের রূপান্তর ঘটার পিছনে রয়েছে মূলত অর্থনৈতিক কারণ। সে সময় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণী নানা ধরনের ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নায়েব-দেওয়ানকে সামনে রেখে রাজস্ব বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সে পর্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের অনুসারী স্বার্থের সঙ্গে ভারতের কৃষি উৎপাদনকে জুড়ে দেওয়া হয়। এককথায় ইংল্যান্ড তার উপনিবশে ভারতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ বহুবার বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী দ্বারা বিজিত হয়েছে। কিন্তু সে রাজনৈতিক জয়ের ফলে রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল ; গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। গ্রামীণ সমাজের চরিত্র তাই অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের অগ্রগতি ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় এনেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে পরিবর্তনগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৪২.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূ মিব্যবস্থা ছিল তিন ধরনের—জমিদারী, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী। (১) ব্যক্তিগত আনুকূল্যে চাষ-আবাদ হলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে ও কৃষিবিপ্লব ঘটবে (যা ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে ঘটেছিল), (২) উদীয়মান জমিদাররা শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ শাসকের হাতকে শক্ত করবে, (৩) দক্ষতার অভাব দেখা দিলে জমিদারী হাত বদল হবে (বিক্রি)—এই তিন চিন্তা মাথায় রেখে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয় জমিদারী ব্যবস্থায় যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বপ্রথম গ্রামের অধিকারভিত্তিক প্রাচীন ভূমিব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি করে। নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব রক্ষার সামাজিক সমর্থন অর্জন করার প্রশ্নটি মাথায় রেখে জমিদারদের জমির কেনাবেচার অধিকার দান করে রাজনৈতিক স্বার্থও চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। অপর একটি ভূমিব্যবস্থা রায়তওয়ারী, যেটিতে কৃষক জমি কেনাবেচার অধিকার লাভ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশের ৫১ শতাংশ জুড়ে ছিল এই ব্যবস্থা। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ও জমিদারী ব্যবস্থা উভয় রাজস্বনীতিই গ্রামভিত্তিক মালিকানার ভারতীয় প্রথাকে ভেঙে দেয়। এইভাবে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তিতে পরিণত হয়, জমি হয়ে ওঠে কেনাবেচাযোগ্য পণ্য (সব্যসাচী ভট্টাচার্য—*ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬-২০)।

৪২.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যকীকরণ

নূতন ভূমি-সম্পর্ক ও রাজস্ব প্রদানের প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে গ্রামীণ কৃষির আদিরূপ বদলে গেল। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন কেবল প্রয়োজনভিত্তিক ছিল এবং গ্রামীণ বাণিজ্য কেবল হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অধ্যাপক এ. আর. দেশাই যে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব সে যুক্তিকে অবশ্য খন্ডন করেছেন। গ্রামগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিদ্রব্য যে শহরের বাজারে

আসত—অধ্যাপক হাবিবের গবেষণা সেটি প্রমাণ করেছে (Irfan Habib—*The Agrarian System of Mughal India.* Bombay, 1963) এই বিতর্ক থাকলেও আজকের দিনে যে গণেশ কৃষি-লক্ষ্মীকে চালনা করে'—তার সূচনা কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে। গ্রাম ছেড়ে ফসল শহরে বিক্রির সূচনা হল কয়েকটি কারণে—(ক) নগদে রাজস্ব প্রদানের তাড়নায় ফসল বিক্রি, (খ) ঔপনিবেশিক স্বার্থে রেল, বন্দর, রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শহরে মাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি, (গ) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করার চাহিদা, যা ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর গবেষণায় ধরা পড়েছে। (B. B. Chowdhury—*Growth of Commercial Agriculture in Bengal, 1757-1900,* Calcutta, 1964) ক্রমশ কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন ও চাহিদা নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর। তাই গ্রামের অর্থনীতি যুক্ত হল বিশ্ববাজারের সঙ্গে। আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুসারী। কুটির-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা হলো, দেখা দিল 'অবশিল্পায়ন'। সমাজে সৃষ্টি হল নূতন শ্রেণী,—মহাজন, দালাল, ফড়ে, বেনিয়া পাইকার। জাতপাতভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। গ্রামসমাজে নূতন ধরনের শোষণের সূচনা হল।

৪২.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স লিখেছেন—'ভৌগোলিকভাবে দেখলে কয়েক শত বা হাজার একর আবাদী বা পতিত জমি নিয়ে একত্র কটি গ্রাম, রাজনৈতিকভাবে দেখলে পৌরগোষ্ঠীর মতো। রাজস্ব আদায় থেকে পুলিশের কাজ, শস্যপাহারায় সহযোগিতা থেকে ক্ষুদে বিচারপতি, শাসনকর্তা থেকে সীমানদার—এই সরল পৌর-শাসনের আওতায় দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসী বাস করে এসেছে।...এই ছোটছোট সনাতন সামাজিক সংস্থাগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের ধাক্কায় ভেঙে গেছে। তার কারণ রক্তচোষক করসংগ্রাহকারী বা কোম্পানির বর্বর সৈন্যদের অত্যাচারে নয়, ইংরেজদের বাষ্প ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই (মার্ক্স ও এঙ্গেলক—*প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম,* মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ১৮-১৯) গ্রামসমাজ তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নিয়ে সবরকমের রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে বেঁচে ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতরি চাপে ও রাজনৈতিক শাসন ও বাণিজ্যিক প্রভাবে ভারতীয় গ্রামসমাজ পরাভূত হলো। এই পরিবর্তনকে একদল স্বাগত জানিয়েছে, অপরদল বিরোধিতা জানিয়েছে। এ. আর. দেশাই প্রমুখ লেখকরা (এমনকি কার্ল মার্ক্সও) মনে করেন জাতীয়তাবাদের প্রসার, সংস্কৃতির গুণগত মান ও উন্নত সামাজিক জীবনকল্পে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করেছেন (গান্ধীজি থেকে রবীন্দরনাথ) তাদের মতে, গ্রামসমাজে পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে-কাটা সূতা থেকে কাপড় বোনা ও নিজের হাতে চাষ ; সমন্বয়ের কুটিরশিল্প যা আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি—সেটি হারিয়ে গেল। মানবিক সম্পর্ক অবলুপ্ত হল। একটা আর্থিক নিরাপত্তা ছিল যা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছিল—সেটিও হারিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ক্রমে গ্রামসমাজের কাজকর্ম (বিশেষত প্রতিরক্ষা) নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় স্বশাসিত গ্রামসমাজ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাসনের অঙ্গে পরিণত হতে থাকে, গ্রামের অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গ্রামের আর্থিক ও

শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব লোপ পাওয়ায় যৌথ সহযোগিতার পরিবর্তে গ্রামজীবনে দেখা দিল প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক (*A. R. Desai—Social Background of India Nationalism,* p. 40. Bombay, 1876)।

৪২.৩ বাংলায় ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থার যথার্থ পরিচয় দান আজও সম্ভব নয়, কারণ নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাব। তাম্রফলক ও লিপিমালা থেকে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তার দ্বারা ভূমির স্বত্বাধিকারী নিয়ে বিতর্কের অবসানও হয়নি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বাংলার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে না, তবে পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্যাদি পর্যাপ্ত থাকায় অবশ্য মধ্যকালীন ভারতে রাজস্ব ও ভূমিবিন্যাস এবং ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

৪২.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা

৮০০ খ্রিঃ পূর্ববর্তী লিপিগুলি থেকে বাংলায় প্রধানত তিন ধরনের ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়—বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র ; অর্থাৎ বাসযোগ্য ভূমি, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও অনাবাদী ক্ষেত্র। পরবর্তী লিপিমালাতে তল, বাটক, আলি ইত্যাদি ভূমিরও উল্লেখ দেখা যায়। একাধিক লিপিমালায় বনভূমি, গোচারণ ভূমিদানের কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। গুপ্তযুগে শস্য উৎপাদনের পরিমাপ দেখে ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত হত। গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল। ভূমির মূল্য কি হতে পারে সে সম্পর্কে কোন উপাদান বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে রাজস্ব হিসাবে উৎপন্ন শস্যে $^{১}/_{৬}$ অংশ বিশেষ এলাকায় সংগ্রহ করা হত, তার প্রমাণ রয়েছে। হাট, খেয়া পারাপার ইত্যাদি ওথকেও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ৮০০-১৩০০ মধ্যবর্তী লিপিগুলি ভূমিদানের লাক্ষ্য বহন করে, এর থেকে অনুমান করা যায় সে সময় জমি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন প্রায় ছিলই না। রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার উপর যথেচ্ছার করতেন না (দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়—*বাঙালীর ইতিহাস*)।

৪২.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা

দিল্লীতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট কোন রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু খরচার জন্য কৃষি থেকে উৎপন্নের একাংশ আদায়ের প্রয়োজন ছিল, তার জন্য চাই একটি সরকারি যন্ত্র ; গড়ে ওঠে 'ইক্তা' ব্যবস্থা। মোরল্যান্ড ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারী অধিকারকে বলেছেন 'ইক্তা' এবং 'ইক্তা'র অধিকারী 'মুক্তি'র ছিল কিছু সামরিক দায়িত্ব। আলাউদ্দিনের শাসনকালে 'ইক্তা'র গঠন ও চরিত্রে পরিবর্তন আসে। মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজস্বব্যবস্থা একটি উন্নত রূপ পায়, যার সূচনা হয়েছিল অবশ্য শেরশাহের আমলে। আকবর টোডরমলের সাহায্য নিয়ে যে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেটি 'আসল জুমা তুমার' নামে পরিচিত। ১৫৮২ খ্রিঃ বাংলার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা (N. K. Sinha—*The Eco-History of Bengal,* vol.II, Calcutta, 1968, p. 12)। কাগজে-কলমে সম্রাট খাজনা সংগ্রহের অধিকারী হলেও বাস্তবে সে অধিকার

অর্পণ করা হয় তাঁর শাসকশ্রেণীর কিছু লোকের হাতে। সামরিক দায়িত্ব পালনের অধিকারী বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তিকে বলা হতো 'মনসবদার', যারা একটা নির্দিষ্ট এলাকার 'জাগীর' পেতেন, যার খাজনা বেতনের সমান। দ্বিতীয় ধরনের রাজস্ব আদায়কারীরা ছিল জমিদার, এরা খাজনা আদায় করা ছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচারসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত জমিদারগণ মালগুডারী, পেশকাশি ও খিদমৎকারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মুঘল যুগে খালসা ও জাগীর দুই ধরনের জমিতেই জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলার রাজমহল, রংপুর ও মেদিনীপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাতেও জমিদারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব চোকে পড়ে। মুঘল যুগে মূলত বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত জমিদারদের দ্বারা। জমিদারদের উপর সরকারি চাপ যে বিশেষ ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে—

সাল	বাংলায় নির্ধারিত রাজস্ব (টাকা)
১৫৮২	১,০৬,৯৩,১৫২
১৭০০	১,১৭,২৮,৫৪১
১৭২১	১,৪১,০৯,১৯৪

(সূত্র—*The Economic History of Bengal,* vol-II, pp. 8-9)।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মুঘল শাসকরা জমিদারদের কখনই জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইত না। রাজস্ব জমা অনিয়মিত হলে ব্যক্তিগতভাবে পীড়ন করা হত তেমনি প্রয়োজনে রাজস্ব মকুবের ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে রাজস্ব সংহ্রহে কঠোরতা থাকলেও দুর্নীতির হার ছিল কম। বাংলায় জমিদারী প্রথা মুসলিম শাসনের পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তারা পরবর্তীকালে খাজনা দেবার শর্তে জমির অধিকার ভোগকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করে ভোগদখলকারী জমিদারকে বলা হত 'জঙ্গালবার'। আসলে মুঘল জমিদারী ব্যবস্থায় প্রথাগত বংশানুক্রমিক ভোগদখলী নিয়ম চালু ছিল। আকবর ও পরবর্তী শাসকগণ রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করেন যাদের অধীনে ছিল প্রায় একলক্ষ গ্রাম ; ১৬৬০টি পগগণাকে আবার ৩৪টি সরকারের অধীনে শাসন করা হত (*Eco-History of Bengal,* volII, pp. 8-9)।

মুঘল সরকারের আদর্শ ছিল সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে ছিল বৈপরীত্য। আদায়ের সুবিধার্থে তাই গড়ে উঠেছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী। বিভিন্ন মুঘল দলিলে মধ্যবর্তীকে খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া গেছে। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার বা মধ্যবর্তী শ্রেণী লাভ করছে খাজনার একটা বড় অংশ। সে যুগে নানা কারণে খাজনার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই বোঝা চাষীদের সঙ্গে জমিদারদেরও বইতে হত। ফলে একদিকে যেমন শ্রেণীবৈষম্য বাড়ছে অন্যদিকে খাজনার বোঝা সকল শ্রেণীকে স্পর্ষ করছে।

মুঘল আমলাতন্ত্র ও শাসকশ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে বাংলার কোন ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত ছিল না। এই পদগুলি (সুবাদার ও দেওয়ান) ছিল অন্য যে কোন দায়িত্বের মতো, যার থেকে পদোন্নতি ও বদলীর আশা কর হত কেবল। এই ধরনের সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকার একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইরফান হাবিবের গবেষণা প্রমাণ করেছে : কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে জাগীর হস্তন্তার বিষয়টি প্রধান বাধা

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় মুঘল শাসকশ্রেণী জানতেন, যে তারা সাময়িক দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন। তাই তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ছাপ পাওয়া যায় না। সুতরাং শাসকদের অত্যাচারের যে চিত্র তপন রায়চৌধুরী তাঁর গবেষণার মাধ্যমে (*Bengal Under Akbar and Jahangir)* এঁকেছেন তাকে অনেকাংশেই সমর্থন করা যায়। এই পরিস্থিতিতে সদা বিঘ্নমূলক ব্যয়সাধ্য শক্তি প্রয়োগ না করে মুঘল শাকরা স্থানীয় পর্যায়ে আপোস রফা করে টিকে থাকার চেষ্টা চালায়। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে জমিদরা আখ্যানপ্রাপ্ত স্থানীয় শক্তিধরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়।

৪২.৩.৩ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, যদুনাথ সরকার, আব্দুল করীম ও সম্প্রতি অনিরুদ্ধ রায় মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যে সব আলোচনা করেছেন তার উপর ভিত্তি করে বাংলায় মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব-ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা যেতে পারি। ১৭০০ খ্রিঃ মুর্শিদকুলী খান বাংলার দেওয়ান ও মখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং ১৭১৭ খ্রিঃ থেকে আমৃত্যু ছিলেন বাংলার সুবাদার। নিযুক্তির পর থেকেই তিনি টাকা সংগ্রহের উপর জোর দেন। ১৭০২ এবং ১৭১১ খ্রিঃ বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল বেশি। সম্ভবত দেওয়ানের পদ লাভের জন্য রাজস্বের হার বৃদ্ধি করে তিনি মুঘল সম্রাটের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। ১৭২২ খ্রিঃ মুর্শিদকুলী 'কামিল জমা তুমারী' নামে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। নূতন 'ডাকলা' একক শুরু করে বাংলা সুবাকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করা হয়। তৈরি করা হয় নতুন আর্থিক একক। আসলে মুর্শিদকুলীর লক্ষ্য ছিল কঠোরভাবে রাজস্ব সংগ্রহ, ফলে অত্যাচারের কাহিনী শুরু হতে বাধ্য। সে সময় বাংলায় নগদ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনসবদারদের অন্য প্রদেশে বদলী শুরু হওয়ায় নগদী সৈন্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বেতন না পেয়ে নগদী সেনারা মুর্শিদকুলীকে একসময় আক্রমণও করে। অন্যদিকে মনসবদার বদলী হওয়ায় জাগীর জমিগুলিকে 'খলিসা'য় রূপান্তরিত করা হয় এবং সেগুলি ইজারা দেওয়া হতে থাকে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অভিযোগ করেছেন, মুর্শিদকুলী ছোটছোট জমিদারদের উচ্ছেদ করে বড় জমিদারী গঠন করে কর সংগ্রহের কাজটি সহজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের অর্ধেক আসতো ৬টি বড় জমিদারের কাছ থেকে। যদুনাথ সরকারের অভিযোগ হল দুটি—(১) মুর্শিদকুলী বেশিমাত্রায় ইজারাদারী ব্যবস্থা চালু করায় পুরাতন হিন্দু জমিদারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, (২) মুর্শিদকুলীর আচরণ ছিল হিন্দু জমিদারদের বিপক্ষে। আব্দুল করিমের অভিযোগই ভিন্ন। তাঁর মতে মুর্শিদকুলী জগৎ শেঠকে প্রশ্রয় দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ করেছেন। এই জগৎশেঠই শেষ পর্যন্ত সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে অনিরুদ্ধ রায়ের সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ("মুর্শিদকুলী খানের বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি আলোচনা", ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, পৃ. ২৭৩-২৮১)। ড. রায় যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন—(ক) রাজশাহী ছাড়া অন্যান্য বড় জমিদারীগুলি আগে থেকেই বর্তমান ছিল। 'ইজারা' ব্যবস্থা মুর্শিদকুলীর সৃষ্টি নয়, এটি একটি পুরাতন মুঘল প্রথা। বাংলায় 'ইজারা' ব্যবস্থা চালু হওয়ার জমিদাররা প্রাপ্য 'হক' থেকে কিন্তু বঞ্চিত হয়নি। (খ) জমিদারদের আয় কমে গেলেও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জমিদারী ধ্বংসের পিছনে মূল কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ

কলহ। (গ) দীর্ঘদিন জমি জরিপ না হওয়ায় এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমিদাররা রাজস্ব বাড়িয়ে নেয়। মুর্শিদকুলী এই বেনিয়ম আয় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু, সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের কঠোরতার বিরুদ্ধে এই হিন্দুবিরেপাধী প্রচার গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক। (ঘ) মুঘলদের একটি প্রথা ছিল বাণিজ্য ও ব্যবসার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা। আওরঙ্গজেবও সে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মুর্শিদকুলী ঊর্ধ্বতন কতৃঊপক্ষের প্রথাটি অমান্য করতে চাননি। জগৎ শেঠের স্বাধীনতা ও প্রভাব (বাণিজ্যক্ষেত্রে) সম্পর্কে সে কারণেই মুর্শিদকুলী নিশ্চুপ ছিলেন।

৪২.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি, (১৭৫৭-১৭৭২)

মীরজাফর বাংলার নবাবী পদে বসার উপঢৌকন স্বরূপ নানা অর্থসহ ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করে ইংরেজরা। এটি ছিল বাংলায় প্রাপ্ত প্রথম (আইনগতভাবে) ভূমি এলাকা। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের নেতৃত্বে এই এলাকায় রাজস্ব সংগ্রহ শুরু হয়। তবে এই রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে তাদের কোন নীতি গৃহীত হয়নি। জমিদারীটি পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে জমিদারী এলাকা ১৫ খণ্ডে বিভক্ত করে ইজারার দেওয়া হয়েছিল। জমি ইজারার সময় ফাটকাবাজরা দর তুলে দেওয়ায় তাদের ইজারাদারী পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে সেনাদলের (ইংরেদ) ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হলে মীরজাফর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী কোম্পানিকে প্রদান করে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। এমনকি মীরকাশিমও পূর্বোক্ত এলাকার রাজস্ব কোম্পানিকে সংগ্রাহ ও গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির জ্ঞান ছিল সীমিত। তাই রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে কোম্পানির কাছে তখন দুটি পথ খোলা ছিল—(ক) মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা, যেটি চলে আসছে এবং মুর্শিদকুলী দ্বারা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, সেটি বজায় রাখা নতুবা (খ) একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইংরেজরা যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল তার প্রতি আস্থাশীল ছিল না, অন্যদিকে নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত ক্ষমতাও ছিল না। সুতরাং বাংলার ভূমিরাজস্ব নিয়ে কোম্পানির চলতে থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

প্রথম থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার জমিদার সম্পর্কে অবিশ্বাসী মনোভাবাপন্ন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা রাজস্ব সঠিক সময়ে জমা দিত না ; রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের ছিল অনীহা। কিন্তু খরচার একটা বড় অংশ রাজস্ব থেকে সংগ্রহে কোম্পানির আগ্রহ থাকায় তারা রাজস্ব সংগ্রহের বিকল্প পথ খোঁজে। মুঘল যুগে জমিদারী ব্যবস্থায় ইজারাদার ছিল, কিন্তু তারা ছিল এলাকারই অধিবাসী এবং বংশপরম্পরায় অধিকার ভোগ করত। মুঘল সরকার কখনই প্রত্যক্ষ ইজারাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। কিন্তু জমি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের আশায় ইংরেজরা ফাটকা ইজারাদারদের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেয়। বেনিয়াদের কাছে ইজারা লাভ ছিল মুনাফার এক স্বর্গরাজ্য। ফাটকা ইজারাদারদের সহযোগিতায় অতিরঞ্জন রাজস্ব নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সর্বনাশের অধ্যায়। মীরকাশিমের সময় কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ ও অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণ বাংলায় পুরাতন রাজস্ব কাঠামোয় বড় আঘাত হেনেছিল। উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভরশীল বার্ষিক খাজনা নির্ধারণের সঠিক নীতি সে সময়

ভেঙে পড়ে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাব হলেন নাজম-উদ্-দৌল্লা ; তার নবনিযুক্ত নায়বে নাজিম রেজা খাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হল রাজস্ব বিষয়টি। সে সময় বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাটি জরাজীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানী গ্রহণ করেছে মূলত রাজনৈতিক কারণে।

১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভ ছিল বাংলায় ইংরেজ অধিকারের আইনসঙ্গত স্বীকৃতি। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কোম্পানিকে প্রশাসনিক দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা কোনটাই কোম্পানির সে সময় ছিল না। তাই ক্লাইভ গড়ে তোলেন দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত এক জোড়াতালি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বাংলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন রেজা খাঁ। যেহেতু কোম্পানির তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা, তাই রেজা খংা উপলব্ধি করেন তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণের উপর। ফলে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি নিযুক্ত করেন তাদের যারা বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম। এই কাজে রেজা খাঁ অনেকাংশে সাফল্যও পেয়েছিলেন। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলার সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮১,৬৫,৫৩৩ টাকা ; ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ রেজা খাঁ সেখানে সংগ্রহ বাড়িয়ে করেছিলেন ১,৪৭,০৪,৮৭৫ চাকা (সূত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত—*ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১৭৫৭-১৮৩৭, পৃ. ৮৮)। রেজা খাঁ চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের কুফল সম্পর্কে সাবধান করলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কোম্পানি দেওয়ানী এলাকাও 'Ceeded land'-এর সঠিক রাজস্ব কত হওয়া উচিত এই বিষয়টি নির্ধারণ করতে যেমন পারেনি তেমনি সময় দেয়নি রাজস্বনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্য। সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব না দিতে পারায় অনেক আমিনের কর্মচ্যুতি ঘটল, জমিদারদের অবস্থা হলো আরও সঙ্গীন। প্রশ্ন দেখা দিল ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন নিয়ে।

পরবর্তী গভর্ণর ভেরেলেস্ট রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যাচারী, প্রতারক ও শঠ আমিনদের ক্ষমতা হ্রাস এবং তাদের কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত করলেন সুপারভাইজার। বস্তুত দেওয়ানী এলাকায় সুপারভাইজার নিয়োগ ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৭৭০ খ্রিঃ রেজা খাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমিনদের রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সরে যেতে হয়। Court of Directros-এর নির্দেশে সুপারভাইজাররা ১৭৭২ খ্রিঃ রাজস্ব সংগ্রাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রেজা খাঁর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭০ খ্রিঃ মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় গঠিত হয় "Comptrolling Councils of Revenue"। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ খ্রিঃ স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শস্যের দাম বাড়তে থাকে। ১৭৬৯ খ্রিঃ বাংলায় উৎপাদন ব্যবস্থা আরও ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৭০ খ্রিঃ সমস্গর বাংলায় দুর্ভিক্ষ চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন কোম্পানির সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পায়নি। একদিকে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, ত্রাণ সম্পর্কে শাসককুলের অনীহা, রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচার, অন্যদিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস বাংলার আর্থিক ও সামাডিক জীবনে নিয়ে আসে দুর্দশা। জনসংখ্যার $^{১}/_{৩}$ অংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে পড়ে জঙ্গালাকীর্ণ। এই নৈরাশ্য ও

নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে 'Court of Directors' কোম্পানির কলিকাতা কর্তৃপক্ষকে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে নূতন রাজস্বনীতি গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ক্ষমতায় এসে বাংলায় ভূ মিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে এক ভ্রান্ততম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যেটি 'নূতন ইজারাদারী' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

৪২.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ভূমিরাজস্বের উপর গুরুত্ব দিতে থাকে ; দেওয়ানী লাভের পর চড়া হারে রাজস্ব আদায় শুরু করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো ঘটনা ঘটলেও রাজস্ব বৃদ্ধির হার কিন্তু তারা কমায়নি। ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কালে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড যেখানে ১৮৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানীর সময় রাজস্ব ছিল মাত্র ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ড। কোম্পানির এই ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা লুকিয়ে ছিল। প্রথমত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে রেশম ও বস্ত্রসামগ্রী কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করত সোনা ও রূপা (বুলিয়ন)। ভারতে বিক্রয় করার মতো দ্রব্যও তাদের বিশেষ ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে সোনা ও রূপা বাইরে চলে যাওয়াটি কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখছিল না। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির কাছে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভূমিরাজস্ব একটি আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সংগৃহীত রাজস্বের অর্থ ব্যবসার দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকে সোনা, রূপা পাঠানোর দিন শেষ করতে চায় রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে। ইচ্ছেটা 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে হবে।' এছাড়াও কোম্পানি তার কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করে অতিরিক্ত আয় বিনিয়োগ করতে চায় চীনের বাণিজ্যে। ফলে আয় বৃদ্ধির চাপটি গিয়ে পড়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর। দ্বিতীয়ত, ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং ঈঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মতো ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করতে হয়েছিল কোম্পানিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থে। এই ব্যয়ের অর্থ এসেছিল ভারতীয় রাজস্ব থেকে। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের হার কমে গিয়েছিল, তাই ভূ মিরাজস্ব বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি কোম্পানির কাছে প্রাধান্য পায়। তাছাড়া মাথাভারী প্রশাসনিক কাঠামোতে ইউরোপীয় কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতনের জন্য ব্যয়, ১৭৯৩ খ্রিঃ চার্টার আইন অনুসারে ইংল্যান্ডের 'Board of Control'-এর সদস্যদের বেতন এবং ১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার আইনের ধারা প্রয়োজনে কোম্পানি ডিভিডেন্ট (১০$^{১}/_{২}$%) ভারতে ভূমিরাজস্ব থেকে প্রদানের নির্দেশ—প্রমাণ করেছিল কোম্পানির ভূ মিরাজস্বের উপর নির্ভরতা। সুতরাং বাজেট ঘাটতির উপর নির্ভর করত রাজস্ব বৃদ্ধির হার। তৃতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের শেষে ঔপনিবেশিক শোষণের তিনটি ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—(ক) আমেরিকায় বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে রৌপ্যখনি থেকে সম্পদ আহরণ, (খ) আফ্রিকানদের দাস হিসাবে চালান এবং (গ) এশিয়ার নৌচলাচল ও জমির উপর অতিরিক্ত করের বোঝা। (দেখুন, Capitalism in History—by Irfan Habib (Bengalee Muslim ইতিহাস অনুসন্ধান-১১)। হাবিবের মতে, জাভার কৃষকদের উপর নেদারল্যান্ডসের করভার দিয়ে যে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ভারতে পলাশীর যুদ্ধে%

পর ব্রিটিশ দখলদারী ছিল চূড়ান্ত মুহূর্ত। কোম্পানি তার দখলীস্বত্ত্ব ভূমি এলাকা থেকে গৃহীত রাজস্ব মূলত নিয়ে যেত ভারতীয় বস্ত্রের আকারে। তাছাড়াও নানা আকারে প্রতিবছর বিপুল রাজস্ব ইংল্যান্ডে চলে যেত, যার পরিমাণ অষ্টাদশ শতকের শেষে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাইণ্ড। বাংলা থেকে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে এই পাচারকে অর্থনীতিবিদগণের ভাষায় বলা হয় 'Economic Drain', অম্লান দত্ত বাংলায় তাকে বলেছেন 'অপহার'। অধ্যাপক ইরফান হাব্বি মনে করেন, ঔপনিবেশ থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্পবিপ্লবে উর্বরতা দিয়েছিল। এই নিষ্ঠুর উপনিবেশবাদ ছিল ধনতন্ত্র উদ্ভবের মৌলিক শর্ত। আভ্যন্তরীণ পুঁজি গড়তে পররাজ্যের অর্থনীতিকে দখর করা ছিল জরুরী (দেখুন, ইতিহাস অনুসন্ধান-১১, পৃ. ৮-৯)। এককথায় শিল্পবিপ্লবের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি সরবরাহে ইংল্যাণ্ড অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল বাংলার ভূমিরাজস্বের উপর, তাই সকলেই চেয়েছিল রাজস্ব বাড়িয়ে পুঁজির যোগানকে অব্যাহত রাখতে।

৪২.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

১৭৭০ খ্রিঃ এর পর বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠিত Comptrolling Councils of Revenue-এর সভাপতি নির্বাচন করা হল দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্টকে। ১৭৭১ খ্রিঃ আগস্ট মাসে 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্' দেওয়ানী নিজের হাতে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ভূমিরাজস্বের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিঃ বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু হেস্টিংসের কাছে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী যেমন ছিল না, তেমনি জমির কত রাজস্ব হতে পারে তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিও ছিল না। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, সীমিত ক্ষমতা ও কাউন্সিলের সদস্যদের সদা বিরোধিতা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। এই অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি রাজস্ব বিষয়ক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে সচেষ্ট হন।

৪২.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হেস্টিংস দুটি বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—(১) যেহেতু জেলা, পরগণা বা গ্রামের জমির রাজস্ব সঠিক কত হতে পারে সেটি যখন জানা নেই তখন নিলামের বন্দোবস্ত করে সর্বোচ্চ রাজস্ব কত, সেটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। (২) পাঁচ বছরের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করে রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা। অতপর তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গড়ে তুললেন নূতন প্রশাসনিক কাঠামো। ১৭৭২ খ্রিঃ কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে গঠিত হলো 'বোর্ড অব্ রেভেন্যু' বা রাজস্ব পরিষদ, যার হাতে রইল রাজস্ব পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব। এই পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা হল 'কমিটি-অব্ সার্কিট' যাদের কাজ হল প্রতিটি জেলায় ঘুরে কালেক্টরদের সহযোগিতায় সর্বোচ্চ নিলামের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি ইজারা দেওয়া। এই ব্যবস্থাটি নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। প্রতিটি জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হলেন একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর, যাকে সাহায্য করবে একজন দেশীয় দেওয়ান। অবলুপ্তি ঘটানো হল 'সুপারভাইজার' পদটির।

১৭৭২ খ্রিঃ জুন মাসে হেস্টিংস 'কমিটি অব্ সার্কিট'-এর সভাপতি হিসাবে নদীয়া জেলায় উপস্থিত হলেন। নদীয়াকে ধরা হল সমগ্র প্রদেশের আদর্শ জেলা হিসাবে, সেখানে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে সেই ব্যবস্থা চালু হবে অন্যত্র। নদীয়ার জমিদারকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গে ইজারার ব্যবস্থা হল। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে জমিদারদের ইজারাদারে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকল নানা জেলায়। জমিদার, তালুকদার, ছোট জমিদার সকলেই এখন ইজারাদার—জমিদার বলে কিছু রইল না। কিছুদিনের মধ্যে হেস্টিংসের নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা সবার কাছে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। নিলামে জমি বন্দোবস্তের ফলে অনেকে মর্যাদা রক্ষার্থে ও জেদের বসে চড়া হারে নিলাম জাকলেও রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। ফলে ইজারাদাররা রাজস্ব বাকী রাখে, কেরাম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ভাবনাটি অবাস্তবে পরিণত হয়। তাছাড়াও কোম্পানির কিছু কর্মচারীও বেনামীতে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব বাকী রাখতে থাকে। অন্যদিকে ইজারাদারীতে অংশ নিয়েছিল অইধকাংশ বেনিয়ান ও মহাজন শ্রেণীর লোক ; যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিছল ইজডারাভুক্ত জমি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়। তাদের অধীনস্থ দর-ইজারাদারগণ রায়তদের উপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চালাতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন। অনেক পুরাতন জমিদার যারা বংশমর্যাদা রক্ষার্থে চড়া হারে রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিছলেন, তারাও বিপাকে পড়লেন। উদাহরণস্বরূপ রানী ভবানীর কথা বলা যেতে পারে, রাজস্ব বাকী থাকায় তাঁর জমিদারী কেড়ে নেওয়া হল। সুতরাং সব মিলিয়ে ইজারাদারী ব্যবস্থা চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হেসিংটংস তাঁর পরিক্লপনা ব্যর্থ হয়েছে দেখে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন 'আমিনী কমিশন' (১৭৭৬)। এদিকে পাঁচ বছরের ইজারাদারী ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হলে, তাকে বাতিল করে চালু করা হল অপর এক নূতন ব্যবস্থা।

৪২.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

হেস্টিংসের পঞ্চবার্ষিক নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার আশ্চর্যতম দিক হলো দুর্ভিক্ষের পূর্বের তুলনায় কম সংখ্যক রায়তদের কাছে ইজারাদারদের অনেক বেশি খাজনার দাবী। ফলে এই ইজারাদারী ব্যবস্থার ধাক্কায় 'রায়তরা তলিয়ে গেল দুর্দশার অন্ধকারে, পুরাতন জমিদরা হারালো তার প্রাক্তন সম্মান, দুর্ভিক্ষ যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছিল সেটি নিল আরো ভয়ঙ্কর রূপ' (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ—*বাংলার অর্থনৈতিক জীবন,* পৃ. ৫৩)। ১৭৫৭ খ্রিঃ পর থেকে কোম্পানির রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সামনে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা যেমন অকেজেডা হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে পাঁচসালা নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থাও যে ব্যর্থ হয়েছে সেটি দিবাললোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় 'Court of Directors' রাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন, কমিটি গঠনের মাধ্যমে অনুসন্থান ও ভবিষ্যতে রাজস্বনীতি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এক চিঠিতে জানিয়ে দেয়, আপাতত কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে জমিদারদের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলে ১৭৭৭ খ্রিঃ পাঁচসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষে একসালা বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হলো। এই বন্দোবস্ত অনুসারে—(১) ইজারাদারদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হলো জমিদারদের। জমিদারের থেকে কেউ বেশি রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী থাকলেও সেকানে অগ্রাধিকার পাবে জমিদার। (২)

রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের গড় রাজস্বকে ধরা হল। (৩) রাজস্ব বাকী পড়লে কেবল উৎপন্ন শস্য থেকে বকেয়া মিটিয়ে ফেলা সুযোগ দেওয়া হলো। আসলে এই একসালা বন্দোবস্ত ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, হেস্টিংস একটি স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদারগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইজারাদারী ব্যবস্থার ফলে জমিদার হাতছাড়া হওয়ায় কানুগো কার্যালয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; তাই জমি-সংক্রান্ত দুর্নীতি রোধ করা আর সম্ভব হল না। রাজস্ব যা নির্ধারিত হয়েছিল সেটিও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এই অবস্থায় ১৭৮৬ খ্রিঃ কর্ণওয়ালিস ভারতে এলেন, তার কিছুদিন আগেই পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) কোম্পানিকে রাজস্ব চিরস্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ পালনের দায়িত্বটি পড়ল কর্ণওয়ালিসের উপর।

৪২.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ্য করে থাকি—(১) এই ব্যবস্থাটি ছিল রাজস্ব বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি। (২) অন্যদিকটি হলো তত্ত্বগত ভাবনাচিন্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সাধারণের মনে এই ধারণা ছিল যে কর্ণওয়ালিস হলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতা। এই ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জেমস্ মিল তাঁর 'The History of British India' (London, 1848) গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বিদ্যোৎ সমাজে মিলের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে, অনকের মনে ধারণা জন্মাতে থাকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য একা কর্ণওয়ালিসকে দায়ী করা যায় না। রণজিৎ গুহের A Rule of Property of Bengal', 'An Essays on the Idea of Permanent Settlement', Cambridge Eco-History of India' (vol-2), বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের 'The Eco-Hisotry of Bengal,' (vol-II), ইত্যাদি গবেষণা গ্রন্থ যেমন বিষয়টির উপর নূতনভাবে আলোকপাত করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে বিতর্ক। ড. গুহ ইউরোপীয়দের মার্সিকতা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত গড়ে ওঠার পিছনে ছিল ফরাসী ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ্দের প্রভাব। ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধের বক্তব্য হল, কোম্পানির বাণিজ্যিক উন্নতি বিধানের জন্য ও বুলিয়ন ইংল্যাণ্ড থেকে আসা বন্ধ করতে নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মাল খরিদের (Investment) ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। এইসব নূতন নূতন তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে।

৪২.৭.১ পটভূমি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যখন বাংলার সমগ্র অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে ঠিক তখনই স্কটিশ চিন্তাবিদ আলকজাণ্ডার দাও প্রথম দাবী করলেন, বাংলাকে রক্ষা করতে হলে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত (দেখুন, Alexander Daw—*The History of Hindoostan,* London, 1968)। আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাবের ঠিক দু'বছর পরই এক ফিজিওক্র্যাট হেনরী পেট্রলো তাঁর 'Essays upon the Cultivation of the Lands and

Improvments of the Revenues of Bengal' (London, 1772) গ্রন্থে প্রাক-বিপ্লব যুগের ফ্রান্সের সঙ্গে বাংলার করুণ অবস্থার তুলনা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এই দুই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তার অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানীর কার্যকরী দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং চালু হয় নূতন ইজারাদারী (পাঁচ বছরের জন্য) ব্যবস্থা। এই রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে সে সময়ই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ডেকারস, ঢাকা থেকে রিচার্য বারওয়েনল এবং মুর্শিদাবাদ থেকে মিডনলটন জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির কথা বলেন। নীতিগতভাবে এইসব রাজস্ব কর্মচারীরা একমত হলেও নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে ছিল মতানৈক্য। তবে এই বিষয়ে সবথেকে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারার প্রভাবিত, মন্টেস্কু ও এ্যাডাম স্মিথের লেখায় মুগ্ধ ফিলিপ ফ্রান্সিস। হেস্টিংসের প্রচলিত নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার সমালোচনা করে ১৭৭৬ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে একটি পাল্টা রাজস্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা কোম্পানির কাছে পেশ করেন। এই পরিকল্পনা রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল তৎকালীন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীগণ যারা ছিল চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সমর্থক। ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে এই ধরনের ভূমিব্যবস্থা যদি কৃষিবিপ্লবের সহায়ক হয় তাহলে বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা কৃষিবিপ্লবের জন্য গ্রহণ করা উচিত। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, মুঘল যুগেও ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, তাই কোম্পানির এখন উচিত ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নিয়ে জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি করা। ফ্রান্সিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বিষয়গুলি ছিল—(ক) জমিদারদের জমির একমাত্র মালিক বলে ঘোষণা করে চিরকালের জন্য তাদের উপর সরকারি খাজনা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। (খ) রায়তদের অধিকার ও স্বার্থ জমিদারদের উপর ছেড়ে দেওয়া। (গ) বাংলার জমিদার শ্রেণী ইংল্যাণ্ডের ভূস্বামীদের ন্যায় উন্নতিকামী হয়ে উঠবে সে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখা (মুনতাসীর মামুন—*চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪০-৪১)। 'Court of Directors' অবশ্য ফ্রান্সিসের পরিকল্পনা এবং হেস্টিংসের ইজারাদারী ব্যবস্থা উভয়ই বাতিল করে দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত নীতি গ্রহণ করে। ১৭৮৪ খ্রিঃ পিটের ভারতে আইনে অবশ্য রাজস্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়। ১৭৮৬ খ্রিঃ Court of Directors-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে কর্ণওয়ালিস ভারতে পৌঁছালে শোর ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে দেখা দেয় বিতর্ক। সে সময় শোর চিলেন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে বিশারদ ব্যক্তি। কর্ণওয়ালিস তাঁকে রাজস্ব উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। নীতি প্রণয়নে যে শোরের উপর কর্ণওয়ালিস ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এখন সে ব্যক্তিটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়. অন্যদিকে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে জেমস গ্রান্ট ; বাংলার রাজস্ব বিষয়ে তাঁরও ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এই বিতর্ক চলেছিল তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে—(১) জমির প্রকৃত মালিক কে? কার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হবে? (২) রাজস্বের পরিমাণ কত হবে? (৩) চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত কি যুক্তিযুক্ত হবে? এই বিতর্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে—

৪২.৭.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

গ্রান্ট	শোর	কর্ণওয়ালিস
(ক) মুঘল আমলে রাষ্ট্রই ছিল জমির মালিক। জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করত। তার বিনিময়ে জমিদার পেত পারিশ্রমিক। সরকার ইচ্ছা করলে জমিদার ও প্রজা ইচ্ছামতো ব্যক্তির সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করতে পারে।	(ক) জমিদারই ছিল জমির প্রকৃত মালিক, কিন্তু সরকারকে রাজস্ব প্রদানে তারা বাধ্য। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা যেহেতু জমিদারদের রয়েছে, সুতরাং রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত তাদের সঙ্গেই করা উচিত।	(ক) বাংলার কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ। কযষির উন্নয়নের জন্য দেশীয় জমিদারদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে জমিদাররাই জমি ভোগ করায় মালিকে পরিণত হয়েছে। সরকারের নির্ভরযোগ্য সমর্থক পরিণত করতে হলে রাজস্ব বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই করতে হবে।
(খ) মুঘল আমলে মীরকাশিমের সময় রাজস্ব সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি দেওয়ানী গ্রহণের সময় যে রাডস্ব ছিল সেটিকে ধরেই রাজস্বের হার চিরস্থআয়ী করা যেতে পারে।	(খ) মুঘল আমলে ঘোষিত রাজস্ব অপেক্ষা প্রকৃত আদায়ের হার ছিল বেশি। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের জন্য তথ্য ও তদন্তের আরো প্রয়োজন। আপাতত ১৭৮৭ খ্রিঃ আদায়ীকৃত রাজস্বকে হার হিসাবে ধরা যেতে পারে। তথ্য জোগাড়ের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রকৃত রাজদস্ব কত হবে।	(খ) বিগত ২৫ বছর ধরে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ যখন সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আর অপেক্ষা করা যায় না। ১৭৮৯ খ্রিঃ আদায়ী রাজস্বকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ধরে সেটিকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।
(গ) রাজস্বের হার চিরস্থায়ী হলেও জমিদারদের সঙ্গে এই মুহূর্তে চিরস্থায়ী করা ঠিক হবে কিনা ভাবতে হবে।	(গ) জমিদারদের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলে ভবিষ্যতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে না। আপাতত দশ বছরের জন্য চুক্তি করে জমি জরিপ ও তথ্যাদি সংগ্রহ চলতে পারে। পরে চিরস্থায়ীর কথা ভাবা যাবে।	(গ) কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ, তাই সত্ত্বর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী করতে তিনি আগ্রহী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করায় দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে। জমিদার চিরস্থায়ী স্বত্ত্ব পেলে কর সংগ্রহ ও কৃষির উন্নতিতে মনোযোগী হবে। অন্যদিকে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে আসবে স্থিতিশীলতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে শোর, গ্রান্ট ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল না। বিতর্ক দেখা দেয় চুক্তি কাদের সঙ্গে হবে এবং কখন করা উচিত এটি নিয়ে। এই অবস্থায় কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রিঃ বাংলা ও বিহারে চালু করেন দশসালা বন্দোবস্ত, ১৭৯০ খ্রিঃ উড়িষ্যাতেও সেটি কার্যকরী হয়। কর্ণয়োলিস, শোর ও গ্রান্টকে জানান যে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুমতি না পাওয়া অবধি দশসালা বন্দোবস্তই চালু থাকবে। ইতিমধ্যে গহ্রান্ট,স শোর প্রমুখের সুপারিশ ও কর্ণওয়ালিকের বক্তব্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'Court of Directors'-এর কাছে। কোর্ট বিষয়টি নানা দিক থেকে পর্যালচেনা করার পর কর্ণয়োলিসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে চিঠিতে লেখে, 'আমরা মনে করি নানা সমস্যার অবতারণা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে পিছিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশের সুখ-সমৃদ্ধিকে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং আমরা আদেশ করছি, ইতিমধ্যে যদি নূতন কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তবে অনতিবিলম্বে জমিদারদের সঙ্গে দশবর্ষীয় যে বন্দোবস্ত হয়েছে সেটি চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হউক' (*General Letters to the Court of Directors,* Revenue Dept., vol. VI, letter dt. 15.12.1787)। এই চিঠি প্রাপ্তির দু'মাসের মধ্যে কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেন।

৪২.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। এরিক স্টোক্স (Eric Stokes) লিখেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভূমিক্ষেত্রে একটি রাজস্ব সংগ্রহমুখী ব্যবস্থাই ছিল না, সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে।' (Eric Stokes—*The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian, Society and the Pleasant Rebellion in Colonial India,* Cambridge, 1978)। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চহারে রাজস্ব সংগ্রহের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার প্রভাব নানাভাবে পরিস্ফুট হয়।

৪২.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

ভারতে ইংরেজ শাসনের আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে। কার্ল মার্ক্সের মতে, ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তিত কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিল নির্মমভাবে। সেটি সম্ভব হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা প্রথমে জমিদারে রূপান্তরিত হয় তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ক্রমে এই পুরাতন জমিদারগণ রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের জমিদারী নিলামে ওঠে। সেগুলি কিনে নেয় মহাজন, ব্যবসায়ী ও বেনিয়ার দল। এতদিন সমাজের চোখে যারা ছিল ফাটকাবাজ ও দালাল, তারাই জমিদারী নিলামে কিনে নিয়ে সামাজিক মর্যাদালাভের সুযোগ গ্রহণ করে। মোটকথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সঙ্গে বাংলার পল্লী এলাকায় জমিদারী ও রায়ত এই দুই শ্রেণীর বিকাশ ঘটে, ক্রমে অবশ্য এদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যাদের ছিল আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে গ্রামে বা শহরে বসবাস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর একটি কুফল ছিল মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব। অশিক্ষিত দরিদ্র

রায়ত ও অলস অভিজাতদের উপর সুযোগ বুঝে যারা শিকারী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক যখন খাদ্য, ফসলের বীজ ও গবাদি পশু কেনার জন্য অর্থের সন্ধানে মহাজনদের বাড়িতে উপস্থিত হত, ঠিক তখনই অভিজাতরা (তথাকথিত) হাজির হত সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনের জন্য অযাচিত খরচের অর্থ ধার করতে। এই সুযোগে মহাজনরা ঐতিহ্যবাদী সাইলকের মতো উভয়কে শোষণ করত। সুতরাং নূতন রাজস্ব কাঠামোর সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের।

নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে নগদে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় যা কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পূর্বে কৃষিজাত দ্রব্য সাধারণত গ্রামের প্রয়োদনেই উৎপন্ন হত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিদ্রব্য বাজারের পণ্যে পরিণত হয়। শিল্পবিপ্লবজনিত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে যেমন নূতন ধরনের কৃষি উৎপাদন শুরু হয়, দেখা দেয় কৃষির বাণিজ্যকীকরণ। কৃষিদ্রব্য কেনার জন্য গ্রামে 'কড়িয়া' নামে এক শ্রেণী কাজ করতে শুরু করে। এইভাবে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে, প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক স্মারগুলোও তার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

৪২.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব

ইংল্যান্ডে জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার ফলে জমিদাররা জমিকে উৎপাদনশীল পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে শুরু করে। শিল্পবিপ্লবের ফলে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জমিদে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এটি দেখে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকরা প্রচার শুরু করে যে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আসবে। এই বিষয়ে সোচ্চাচর হয়ে উঠেছিলেন, ফ্রান্সিস, শোর ও কর্ণওয়ালিস। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিঃ পর কার্যত দেখা গেল জমিদাররা জমিকে পুঁজিড বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল দেশে এমন এক আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে মনে হয় কৃষিতে বিনিয়োগ করলে মুনাফার হার বেশি হচ্ছে। ইংরেজ শাসকরা সেটি তৈরি করেত ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে জমি থেকে আয়ের বড় অংশ জমিদাররা বিনিয়োগ করেছিল অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে (বিলাসিতায়)। কৃষি উন্নয়নে জমিদারদের অনীহা শাসককুলকে নিরাশ করে। এই শিক্ষা নিয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানে চালু করা হয় মহলওয়ারী ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

৪২.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

অর্থনীতির সাথে সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটি সর্বজনবিদিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের ৫০ বছর ছিল সংঘ ও সমিতি গঠনের যুগ। ভারতের সে সময়ের রাজনীতি ছিল এই সংঘগুলির প্রাধান্য। যেমন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' যার অধিকাংশ সদস্য জমিদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের প্রয়োজনে এদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। এই সংঘ তার কার্যকলাপকে কলিকাতার বাইরে প্রসার ঘটাতে যেমন সক্ষম হয়নি তেমনি রক্ষা করে চলেছিল কেবল জমিদারদের স্বার্থ। জমিদাররা বিভিন্ন সংঘ বা সমিতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম

গোষ্ঠীস্বার্থ বর্ণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভেদের সৃষ্টি করে (Anil Seal—*The Emergence of Indian Nationalism,* London, 1968, p. 200-229) ১৮৮৫ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেস গড়া হয়, যেটি সঠিক অর্থে ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ; কিন্তু সেখানে জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় শ্রেণী, ধর্ম ও বর্ণের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবসত্রে মধ্য দিয়ে যে জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। ঊনবিংশ শতকে রাজনীতিতে যেহেতু জমিদার গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল সেহেতু বাংলার রাজনীতি তখন ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। ব্রিটিশদের তুষ্ট করে যতটা নিজেদের দাবীদাওয়া আদায় করা যায়। নরহরি কবিরাজের ভাষায় 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসসন্তোষ, ব্রিটিশের বিচারবুদ্ধির উপর অদ্ভুত ভরসা ও উপর্যুপরি পরাজয়ের পর অবসাদ—এই ছিল সেসময়ের (ঊনবিংশ শতক) রাজনীতির আসল কথা (প্রবন্ধ ঃ নরহরি কবিরাজ—*বাঙালী রাজনীতির গোড়ার কথা,* পরিরচয়, ১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৪৫-৪৬)। নূতন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নূতন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ এক না থাকায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এদের হাত থেকে নেতৃযত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল মধ্যবিত্তরা।

৪২.৯ সারাংশ

বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক (Seeley) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতামালায় বক্তব্য ছিল ইংরেজরা আকস্মিকভাবে ও বিনা অফিপ্রায়ে ভারতে রাজস্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু নানা তথ্যাদি সে কথা প্রমাণ করছে না। ১৬৮৭ খ্রিঃ মাদ্রাজ ও ১৬৮৯ খ্রিঃ বোম্বাই কর্তৃপক্ষকে বিলাত থেকে (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা) যে নির্দেশ পাঠিয়েছিল তাতে 'চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে এক বিপুল, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল [হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—*ভারতবর্ষের ইতিহাস* (মুঘল ও ব্রিটিশ যুগ), কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৭০-২৭১)]। একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রসর হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। এযুগ বিশ্বাসঘাতকতার জয় নয়, এটি ছিল আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের জয়। ১৭৬৪ খ্রিঃ মীরকাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের মদ্য দিয়ে কোম্পানি বাকি দুটি ধাপ অতিক্রম করে আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করার যন্ত্রগুলিকে করায়ত্ত করে। কোম্পানির বাংলার অর্থনীতকিে সাজিয়ে নেয় নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে, ঔপনিবেশিক স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে। ফলে বাংলার তথা ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে, অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজাতে থাকে ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুসারী হিসাবে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি যোগানের প্রয়োজন যেমন তেমনি প্রয়োজন ছিল বাজারের। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে এই দুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছিল। আধুনিক কিছু গবেষক মনে করেন, ভারতের সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামোকে ইংরেজরা সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করে ঔপনিবেশিক

স্বার্থের অনুকূলে। ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর। এই নব্য জমিদার 'বাবুশ্রেণী' নিজেদের নিয়োজিত করেছিল শ্রেণীস্বার্থে ব্রিটিশদের চাটুকারে। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে টিকিয়ে রাখল ক্ষয়িষ্ণু আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-পুঁজিবাদী শ্রেণী ধ্যানধারণায় পুষ্ট একটি সামন্ত-বুর্জোয়া সংস্কৃতির জন্ম হল বাংলা প্রদেশে যেটি 'বাবু কালচার' নামে পরিচিত।

৪২.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামসমাজের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল ?

২। দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলা মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোটি কেমন ছিল ?

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিক কে ছিল ? ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিকানায় কি পরিবর্তন ঘটে ?

২। মুর্শিদকুলী খানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর আলোকপাত কর।

৩। ইংরেজরা কেন সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করে ?

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কি কি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শোর ও কর্ণওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয় ?

২। কৃষিদ্রব্যের বাণিজ্যকীকরণ বলতে কি বোঝ ?

৩। নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা কি ?

৪। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

৪২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Desai, A. R.—Social Background of Indian Nationalsim, Bombay, 1976 (Reprint).

২। Haque, M. Ajujul—The Man Behind the Plough, Dacca, 1980.

৩। Habib, Irfan—The Agrarian System of Mughal India, Bombay, 1963.

৪। Sinha, N. K.—The Economic History of Bengal (From Plassey to Permanent Settlement) Vol.-II, Calcutta, 1968.

৫। Stein, Burton (Ed).—The Making of Agrarian Policy of British India, 1770-1900, New York, 1992.

৬। Kumar, Dharma (Ed.)—The Cambridge Economic History of India, vol-II (1757-1970), Delhi, 1984.

৭। Singh, Yogendra—Modernization of Indian Tradition, Jaipur, 1986.

৮। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম : ইতিহাস অনুসন্ধান, ১১ ও ১৩।

৯। দত্ত, রমেশচন্দ্র : ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭, কলিকাতা, ১৩৭৯।

১০। রায়, অনিরুদ্ধ : মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৬।

১১। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, কলিকাতা, ১৯৯৬।

১২। মামুন, মুনতাজীর (সম্পাঃ) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৫।